Prabah- Biswajit roy

প্রবাহ

বিশ্বজিৎ রায়

ওপারে তেলেনিপাড়া। এপারে জগদ্দল-শ্যামনগর-নৈহাটি। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই মুখটায় রত্নেশ্বর ঘাট। উত্তর শহরতলির শিল্পাঞ্চলের ওই শ্মশানঘাটে আসার কথা অরণি কখনও কল্পনা করেনি। সেন্টুদার জন্য আসতে হল। আসবে কী না তা নিয়ে দোনোমোনো করছি সকালে। গেলে একটা সিএল নষ্ট। না গেলে আত্মীয়-স্বজন কথা তুলবে। বাবা-মা নেই আর। এ বাড়ির প্রতিনিধি বলতে সে আর ছোট ভাই অনুপম। সে তো ফোনে শুনেই হাঁকিয়ে দিল— আমার অফিসে আজ জরুরি মিটিং। তুই যা দাদা। শত হলেও তুই বড়। তোর যাওয়াটাই ভাল দেখাবে। অগত্যা। বিরক্তি নিয়ে এলেও এখন একটু অন্যরকম লাগছে। দাহ শেস হয়ে গিয়েছে। সেন্টুদার পাড়ার ছেলেপুলেদের সঙ্গে ঘোলাটে গঙ্গাজল ঢেলে চিতা নেভানোয় হাত লাগিয়েছে অরণিও। পোড়া কাঠকয়লার মতো দগ্ধাবশেষ— সেন্টুদার নাভিকুণ্ড থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনও। ডোম সেটা বাখারি দিয়ে তুলে গঙ্গামাটি ভরা মাটির ছোট ঘটে দিয়েছে। যেটা গঙ্গায় ফেলে বাড়ি ফিরবে শ্মশানবন্ধুরা। মিতাবৌদির মুখ মনে পড়ায় এখন একটু কষ্ট বোধ করছে অরণি। আজকাল নিজের আনন্দ বা কষ্টগুলোকেও ঠিক চিনতে বুঝতে পারে না। সবেতেই যে সংশয়ের কাঁটা থাকে।

শ্মশানে আসার আগে সেন্টুদার মুখটাই ভাল করে মনে করতে পারছিল না। কমপক্ষে বছর দশেক তাকে দেখেনি ও। বাবা-মা বেঁচে থাকতে মাঝে মধ্যে আসত সেন্টুদা আর মিতা বৌদি। ওদের দেখলে দু'জনেই খুব খুশি হতেন। বাবা-মা চলে যাওয়ার পরও দু-একবার এসেছে সেন্টুদা, কিন্তু অরণি বিশেষ পাত্তা দেয়নি। এমনিতেই সে ব্যস্ত চাকুরে। সকালে বেরয়, রাতে ফেরে। বাড়িতে থাকেই বা কতটুকু সময়। মাসে দশদিন বাইরে ট্যুরে কাটায়। নিজের ছেলে-বৌয়ের সঙ্গেই রোজ কথা বলার সুযোগ হয় না। ফ্রিজের গায়ে সাঁটা কাগজে পরস্পরের সঙ্গে কেজো বার্তা, নির্দেশ বিনিময় চলে। অরণির বৌ কাবেরী একটা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, চলতিতে যাকে এনজিও বলে, তার বড় পদে আছে। সেও হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ায়। দু'জনের ছেলে অরিত্র নিজের কেরিয়ার গড়ায় তন্নিষ্ঠ। স্টেটসে ন্যানো টেকনোলজি পড়তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে যার নিজের জগতে ওরা ব্যস্ত। পারিবারিক আড্ডাও অনিয়মিত। ফলে অরণির পিসতুতো দাদা-বৌদি, উত্তর শহরতলির জুটমিলের শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা ঝালানোর সময়, সুযোগ এবং ইচ্ছে কোনওটাই ওদের ছিল না। কবেকার কোন উদ্বাস্তু পরিবার এপারে এসে কচুরিপানার মতো ভাসতে ভাসতে কোন চড়া, কোন পাঁকে এসে আটকালো, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে কে কোথায় কেমনভাবে বেঁচে রইল, তাদের উত্তর প্রজন্ম কখনও শিকড়-বাড়কড়কে চিনতে পারবে কিনা— এসব নস্ট্যালজিক পারিবারিক ইতিহাসচর্চার বাতিক অরণির পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনে কখনও দেখা যায়নি। আর গরিব ক্ষয়াটে চেহারার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে কাবেরী আর সে রাজযোটক। সেন্টুদা বাবার মৃত্যুর পর এসে ওর মিল বন্ধ থাকার কথা বলে কিছু টাকা সাহায্য চেয়েছিল। প্রথমবার কিছু ঠেকালেও পরের দফায় মিতাবৌদি এএস হাত পাতায় পরিষ্কার অসুবিধা আছে জানিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল অরণি। আজ সকালে তাই শ্মশানে অসার সময় ওর কথা শুনে অরিত্র বিশ্বাসই করতে পারেনি। —আই ডোন্ট বিলিভ ইট ড্যাড! তোমার কাজিন জুট মিলে লেবার ছিল? আমার মনে আছে, ছোটবেলায় দেখেছি, দাদু-ঠাম্মার কাছে মোটা বেঁটে মতো একটা লোক আসত। ধুতি পরে, শার্ট গায়ে। দাদুকে লুকিয়ে সিঁড়ির নিচে বিড়ি ফুকত। আই কুড নট স্ট্যান্ড বিড়ি'স স্মেল। তাই বলতে যাচ্ছিলাম। মধুদা এসে বলল, তোমাদের কেমন আত্মীয় হয়। দ্যাট ফেলো ওয়াজ ইওর কাজন, আমি মিন ইওর সেন্টুদা?

মানুষটা মারা গেছে। এসময় ছেলের এ ধরনের কথাবার্তায় খারাপ লাগে অরণির।

—না দ্যাখো! ওভাবে মানুষের চেহারা বা স্ট্যাটাস নিয়ে সবটা বিচার করা যায় না। আফটার অল, হি ওয়াজ দ্য সান অব আ ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি ইন ইস্টবেঙ্গল। দেশভাগ, দাঙ্গা, বাংলাদেশ যুদ্ধ— এসব না হলে সেন্টুদাকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসে জুট মিলে ঢুকতে হত না। চাষবাস দেখাশুনো করেও চলে যেত ভালভাবে। তারপরও দ্যাখো না, সারা জীবন পরিশ্রম করে ওর ছেলে কমলকে আর্মিতে ঢুকিয়েছে। কমল এখন নন-কমিশনড অফিসার। সেন্টুদা শ্যামনগরে বাড়ি করেছে অনেক কষ্ট করে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে। উই মাস্ট অনার হিজ স্ট্রাগল!

নিজের গলায় সেন্টুদা সম্পর্কে এসব শ্রদ্ধাবাচক কথা শুনে নিজেই বেসুরো ঠেকছিল অরিণর। অরিত্রও যেন অবাকই হয়েছিল। জ্ঞান-হওয়া ইস্তক বাবা-মাকে সে দেখেছে তাদের সসঙ্গে আত্মীয়-বন্ধুতার সম্পর্ক রাখতে যারা উর্ধ্বগামী, ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। যাদের নাগরিক জীবনযাপনের চেকনাই সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট, টেরেস গার্ডেন, গাড়িবারান্দায় ছড়িয়ে থাকে। যেসব কালো-কেলো, অশিক্ষিত বা আধা-শিক্ষিত আত্মীয় দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে ছেলের চাকরির জন্য উমেদারি বা মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে আসে, পুরনো সম্পর্কের কাসুন্দি ঘেঁটে দাদু-ঠাম্মার জন্য চোখের জল ফেলে অরণি-কাবেরীর মন ভেজাতে চায়, তারা চলে গেলে বাবা বা মাকেও বলতে শুনেছে— ডিজগাস্টিং!

অরণি একসময় বৃহত্তর পরিবারের আলোকিত অংশের প্রতিনিধি হিসাবে পরিবৃত অন্ধকারের মধ্যে লাইট-হাউসের ভূমিকায় গর্ববোধ করত। বিশেষ করে বাবা-মার সামনে ওর সাফল্যের প্রশংসায় যখন সেন্টুদার মতো লোকের পঞ্চমুখ হত। কিন্তু পরে বুঝেছে অন্যদের আলোয় টেনে আনা হ্যাপা অনেক। এখন তো বাবু-কালচারের জমানা নয় যে হাভাতে আত্মীয়স্বজনের গুষ্টি এসে তোমার বাড়ি বসে ভুষ্টিনাশ করলেও জমিদারি কি

বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিগিরি টাকায় তুমি কাপ্তানি করে বেড়াবে, গৌরী সেন সেজে প্রশংসা কুড়োবে। এখন হল আপনি-কোপনির যুগ। 'পারফর্ম অর পেরিশ'-এর ঠেলায় জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের বয়স হচ্ছে। পারানির কড়ি জোগাড় রাখতে হবে। অরিত্রর হায়ার স্টাডিজ, ফিউচার, কেরিয়ারের ভাবনা আছে। এভাবেই নিজেকে বুঝিয়ে এসেছে অরণি। আর সে জানে, তার মতো করেই ভাবে অধিকাংশ মানুষ। মেইন স্ট্রিমের সুস্থ প্রতিনিধি হিসাবে বাঁচতে গেলে বিবেক-কাঁটার ধ্যাস্টামোও এখন বিলাসিতা, নিজেকে সে চোখ ঠারে এভাবেই।

তবু অরিত্রর উত্তরে সে একটু চটেই উঠল। দোষের মধ্যে দোষ ছেলেটা বাপের কথা শুনে হেসে উঠেছিল।

—তোমাদের ইস্টবেঙ্গলের লোকেদের একটাই দোষ! তোমরা সবাই নাকি পার্টিশনের আগে জমিদার ছিলে! গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু ছিল তোমাদের। দেশভাগ না হলে সবাই রাজার হালে থাকতে! ওই তোমার কাজিনকেও জুট মিলে ঢুকতে হত না, তাই না?

অরিত্রর বলার ঢঙে কাবেরীও হেসে ফেলেছিল। এপারের পরিবারের মেয়ে সে। বাঙালদের গল্পের গরু যে সুযোগ পেলেই গাছে চড়ে তা সে জানে। এ নিয়ে মাঝেমধ্যেই রিফিউজি শ্বশুর-শাশুড়ি তো বটেই, এমনকি কলকাত্তাইয়া অরণিকেও ঠেস দিতে ছাড়েনি।

এই হাসি, শ্লেষ অরণির চেনা। মনে পড়ে গিয়েছিল ছোটবেলায় পূর্ব কলকাতায় একদা মুসলমানপ্রধান এলাকায় একটা কাঠ-টিনের বাড়িতে উদ্বাস্তু পরিবারের জনা চল্লিশেক সদস্যের গাদাগাদি করে থাকার দিনগুলোয় এরকম হাসি শুনেছে সে। সম্পত্তি বিনিময় না জবরদখল, কী করে বাড়িটায় ঠাঁই নিয়েছিলেন ঠাকুর্দা তার পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সেটা জানা নেই ওর। শুধু মনে আছে নবাববাগান, মিঞাবাগান, লতাফৎ হোসেন লেন, কলিমুদ্দিন সরকার লেন, খোদাবক্স লেন— এসব পাড়ায় মুসলমান বাসিন্দাদের বদলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভিড়। আশেপাশে মেছো ভেড়ির বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক নস্কর-সরকারদের থেকেও অনেকে জমি কিনেছে। কেউ কেউ জবরদখল বসে পড়েছে। খালপাড়, চাউলপট্টি রোড ধরে এগোলে একের পর এক গোডাউন বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের আড়ত তারই মাঝে মাঝে করাতকল, কাঠ চোই করে কাঠের প্যাকিৎ বাক্স তৈরির কারখানা, সাবানের গোলা তৈরির কারখানা। কোম্পানি আমলের মারাঠা ডিচ বা সার্কুলার ক্যানেলের সঙ্গে যুক্ত বেলেঘাটা খাল গিয়ে পড়ত বিদ্যাধরীর গাঙে। সেই খাল দিয়ে তখনও পণ্য বোঝাই নৌকা যেত। ওপারে ট্যাংরা আর দক্ষিণ বেলেঘাটার কারখানা, বস্তির সারি। হাড্ডিকলের বোঁটকা গন্ধ ভেসে বেড়াত বসন্ত বাতাসে। শিয়ালদা পেরিয়ে এদিকে ঢুকলে লোকে নাক সিঁটকাতো। 'যার নাই পুঁজিপাটা, হ্যায় যায় বেলেঘাটা'— এমনটা বলত বাঙালরাও। কাঁচা নর্দমা, খাটা পায়খানা, বড় বড় পুকুর, বস্তিতে ভরা আর খাল-ভেড়িতে ঘেরা অঞ্চলটা ছিল রোগব্যাধিরও আড়ত। এশিয়ার সবচেয়ে বড় সংক্রামক রোগের হাসপাতালও যে এহেন জায়গায় তৈরি হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪— দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, চিনযুদ্ধ, নেহরু ও বিধান রায়ের মৃত্যু— এসব মাইলফলক পেরিয়ে ঠাকুর্দা আর বড় জ্যাঠামশাইয়ের নেতৃত্বে গোটা পরিবারটাই ধীরে ধীরে শেকড় গেড়েছিল এই এলাকার বিভিন্ন পাড়ায়। ঢাকার কাছে বিক্রমপুর লাগোয়া গ্রামজীবন, চাষবাস, ব্যবসাপাতি, মুন্সিগঞ্জে বড় জ্যাঠার হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি এসবের স্মৃতি তখনও পারিবারিক আড্ডায় উঠে আসত বারংবার। ঠাকুর্দার ভাইয়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেও নিজের ছয় ছেলে, চার মেয়ের সংসারটিকে এক ছাদের তলায় ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তিনি। বড় জ্যাঠামশাইও পারিবারিক শাসনের বজ্র আঁটুনি ধরে রাখায় অতি তৎপর। ফলে পুজোর সময় ছোট দোতলা বাড়িটির থেকে ছেলেপিলের দঙ্গল বেরলে পাড়ার লোকে আওয়াজ দিত— 'চৌধুরীবাড়ির পলন্ট বাইরইসে।' পল্টনই বটে, চার থেকে চৌত্রিশ একই জামাপ্যান্ট পরনে। লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয় থেকে ঝাকামুটের মাথায় জামা আর একই রঙের প্যান্টের জন্য কাপড়ের থান আসত। পাড়ার দর্জি মাস্টারদার সামনে লাইন দিয়ে ছেলেরা মাপ দিত। বৈশাখী নাপিত বাড়ির উঠোনে ইটালিয়ান সেলুনে বসিয়ে পাইকারি হারে বাটি ছাঁট মেরে যেত জ্যাঠামশাইয়ের নির্দেশে। বড়দের কারও টেরি বাগানোর ইচ্ছে থাকলেও তা মিইয়ে যেত তাঁর রক্তচক্ষুর সামনে। ছেলেপুলেরা কোন ছার, কয়েক সন্তানের জনক কাকা-জ্যাঠারাও তার শাসনে তটস্থ। তেমনই দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল ঠাকুমার। বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ির বৌ-ঝিরা যখন খেয়ে উঠতেন, তখন সামান্য গড়িয়ে নিয়েই তাদের ডাক পড়ত ঠাকুমার ঘরে সান্ধ্য মিটিংয়ে। অ্যাজেন্ডা— রাতের রান্নার আয়োজন। ততক্ষণে অন্নদা ঝি পেল্লায় গামলায় মাইলো-মেশানো আটার স্তূপ মাখতে বসে গেছে। রাত্রে ঘিঞ্জি বাড়ির বিপুল জনসংখ্যার শোয়ার ব্যবস্থাও ঠাকুমার নির্দেশে। অবিবাহিত কাকা, জ্যাঠতুতো, পিসতুতো দাদারা সব শুতো ঢাকা বারান্দায়। ছোট ছোট ঘরগুলিতে চৌকি, খাট বা তক্তপোষগুলি ইটের পাঁজার উপর বসিয়ে উঁচু করা হয়েছে। নিচে বা সামনে ঢালাও বিছানায় ছোট্ট ছেলেমেয়েরা। কচি, দুধ টানা ছানাপোনারা মা-বাপের সঙ্গে খাটে। ছেলেপেলেরা ঘুমোলে বা ঘুমের ভান করে মটকা মেরে থাকার পর বাড়ির বৌরা স্বামী-সোহাগিনী হওয়ার সুযোগ পেত। শাশুড়ির কড়া নির্দেশ ছিল, দাম্পত্য মুহূর্তগুলির কোনও শব্দ যেন সদ্য যুবক-যুবতী ভাগ্নে-ভাইপো-ভাইঝিদের কানে না যায়। সে কারণেই বিছানায় যাওয়ার আগে তারা গয়নাগাটি খুলে রাখতেন, পাছে শরীরী আশ্লেষের মুহূর্তে তা বেজে ওঠে। এহেন বাড়িতে ছোট ছেলে অরণির বাবা বড় ভাইয়ের শাসন না মেনে বৌকে নিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে রীতিমতো গৃহবিপ্লব বাধিয়ে ফেলেছিলেন। পরিণামে এক সপ্তাহ বাড়ি ঢোকা বন্ধ ছিল তাঁর।

বাইরে তখন নকশালবাড়ি থেকে সাঁইবাড়ি, যুক্তফ্রন্ট, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির অনশন নিজের সরকারের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপতির শাসন, নকশাল আন্দোলন, চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, রক্তাক্ত

ভিয়েতনাম আর জয় বাংলা। ওই জয়বাংলা থেকেই খান সেনাদের তাড়া খেয়ে একদিন টিনের বাড়িতে এসে উঠল সেন্টুদা ওর বৌ আর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে। সাতচল্লিশ থেকে সাতষট্টি— ওরা নানা ঝড়ঝাপ্টা সত্ত্বেও ঠাঁইনাড়া হতে চায়নি। সেন্টুদার বাবা কিছুতেই তা হতে দেননি। তিনি মারা গেছেন। এবার টিঁকতে পারেনি সেন্টুদা-মিতাবৌদি। সামান্য কিছু বোঁচকাবুঁচকি একটা তোরঙ্গ নিয়ে তাদের ঠাঁই হল দোতলা বাড়ির একতলায়। একটি ঘরের আধখানা বরাদ্দ হল তাদের জন্য। অরণির মেজ পিসিকে ও দূরে থাক, ওর বাবাই দেখেনি। বাবার জন্মের কিছু পরে বাংলার বহু কিশোরীর মতো মেজ পিসিও সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। সেই দিদির লওতা স্মৃতিকে কাছে পেয়ে বাড়ির সকলেই উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু সেই আবেগ ফিকে হতে বৌ-মহলে শোনা গেল ফিসপাস, হাসাহাসি। ঢাকার বাঙালরা যে ময়মনসিংহ, বরিশালি বা চাঁটগাইয়াদের প্যাঁক দেয় সেটা নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে জানত না অরণি। অনেকটা যেমন ইউপি, রাজস্থানের হিন্দিভাষীরা বিহারের লোকেদের তাচ্ছিল্য করে—'শালা বিহারী হ্যায়'। ঢাকার বাঙালদের সঙ্গে অন্য জেলার লোকেদের বুলির তফাত। এ বাড়ির লোকেরা বলে— খামু না, যামু না। ময়মনসিংহ সেন্টুদা-মিতাদি বলত— খাইতাম না, যাইতাম না। ভাত দেওয়ার সময় অরণিকে জিজ্ঞাসা করত মিতাবৌদি— 'আর দুগা ভাত দিতাম নাহি রে ভাইডি?' শুনে ঢাকাইয়া জেঠি-কাকিরা হাসত। দাদু গল্প করতেন, তার মেজ জামাই, সেন্টুটার বাবা দোজবর ছিলেন। বেশি বয়সে মেজ পিসিকে বিয়ে করেন। দোজবরের হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন দাদা তার জমিজমা দেখে। ওরা নাকি ভাওয়ালের জমিদারদের আত্মীয়। ভাওয়াল রাজার মতো সন্ন্যাসী হয়ে একবার সংসার ত্যাগও করেছিলেন পিসেমশাই পিসিমার মৃত্যুর পর। কিন্তু জমিজমা বেহাত হয়ে যাওয়ার আশংকায় ফিরে আসেন। এইসব জমিদারি চালচিত্রে উদ্বাস্তু, ক-অক্ষর, বিঁড়ি ফোঁকা, মামাদের কাছে হাতখরচ চেয়ে বেড়ানো বেকার সেন্টুদা বা ছেঁড়া শাড়ি পরা মিতা বৌদ্দিকে মোটেই মানাত না। সমবয়সীরা মিতাবৌদিকে ঠেস দিত— 'কোন ধুলাপুরের জরিদারনী আছিলা গো তুমি?' প্রশ্নের সঙ্গে নিজেদের গা টেপাটেপি করে হাসতেন তারা। আর ম্লান হাসি হেসে কুঁকড়ে যেত মিতাবৌদি।

প্রায় দেড় দশক পরে অভ্যাসে, ভঙ্গবঙ্গের এপারের জীবনযাত্রার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলার তাড়নায় ধীরে ধীরে গ্রাম্য বাঙালপনা ছেড়ে কলকাত্তাইয়া ও অর্থনীতির মধ্য ঢুকে পড়েছিলেন এ বাড়ির অনেকেই। কেউ কেউ এক বাড়ি, এক হাঁড়ি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের ঘরে মুরগির ডিম সেদ্ধ করে খেতে শুর করলেন। নানাবিধ বিধি-নিষেধের বেড়াজাল নিয়ে অসন্তোষ বাড়ল। বৈষ্ণব বড় জ্যাঠামশাই হেঁসেলে মাংসা ঢোকানোর বিরোধী। কিন্তু ঘোর শাক্ত মেজ জ্যাঠামশাইয়ের সপ্তাহান্তে মাংস চাই-ই চাই। কেউ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য লুকিয়ে ওভালটিন আনতে শুরু করল। কোনও বৌ স্বামীর জন্য মাছের বড় টুকরো সরিয়ে রেখে দেওর-ননদদের বঞ্চিত করেছে তা নিয়ে সান্ধ্য বৈঠকে অভিযোগ উচ্চকিত হল। ইট-চুন-সুরকির সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা থেকে দাদু সরে আসার পর ভাইদের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ল। ভাঙনের শব্দ ক্রমশ বাড়ছিল। এসময় সংসারের খরচের দায় নিয়ে উতোরচাপান স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে সেন্টুদা ও তার পরিবারের বিপুল ভাতের খিদে এবং অন্যান্য খরচের দায় নিয়ে অসন্তোষ চাপা থাকল না। নিরুপায় দাদুর চাপেই হোক অথবা নিজের ভিটেয় ফেরার তাগিদে, শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার খবর শুনে সেন্টুটা ময়মনসিংহে ফিরে গেল। বৌদিরা রয়ে গেলে এখানেই। সুযোগ মতো নিয়ে যাবে।

কিন্তু বছরখানেক পরে সেন্টুদা ফিরে এল। আসতে বাধ্য হল। পাকিস্তান আমলে হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখলে শত্রু-সম্পত্তি আইন হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলায় বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তধারায় সিঞ্চিত স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে সে আইনে স্রেফ প্রসাধনী বদল হয়। সেন্টুদাদের বসতবাড়ি দখল করেছিলেন এক প্রতাপশালী মুসলমান প্রতিবেশী। তিনি ক্ষমতাসীন বাকশাল জমানার কেষ্টবিষ্টু। ফলে ঘরে-ফেরা সেন্টুদার ভদ্রাসন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ভদ্রলোক নিতান্ত হৃদয়হীন, অবিবেচক নয়। সেন্টুদার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন— 'লন ভাইডি, কইলকাতার কাছে পিঠে জমি পাইলে খরিদ কইর‍্যা লইবেন। আত্মীয়স্বজনের মইদ্যে থাকবেন আনন্দে। আপনাগো বাড়ি আমার জিম্মায় রইল। যহন মনে লইব, ঘুইর‍্যা যাইবেন।' এরপর বাড়ি বিক্রির কোবালায় সইসাবুদ না করে উপায় ছিল না সেন্টুদার। এসবই পরে বাবার কাছে শুনেছে অরণি।

শ্যামনগরে রেললাইনের ধারে কলোনিপাড়ায় এক চিলতে জমিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়ে তুলতে সেন্টুদার এক যুগেরও বেশি সময় লেগে যায়। বহু বছর আগে একবার এসেছিল অরণি। ঘুপচি তিনটে ঘর, মাটির উঠোনের এককোণে খাটা পায়খানা, অন্য কোণে ছোট গোয়ালঘর আর একটা অপুষ্ট পেয়ারাগাছ। টালির ছাউনি পেছনে এদো পুকুর আর সামনে খোলা নর্দমা। সামান্য দূরে রেললাইনের ধারে কচিকাঁচাদের গণ মলত্যাগের দুর্গন্ধ। সেসব ছাপিয়ে উঠেছিল সেন্টুদার স্মৃতি রোমন্থন। ওদের ময়মনসিংহের বাড়ির চারপাশে আম-জাম-কাঁঠালতলার সৌরভ, কড়ি-বরগার উঁচু সিলিংওয়ালা ঘরের পর ঘরে রোদ-বাতাসের গন্ধ আর বর্ষার সময় মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের জলে খালবিল ভাসানো স্রোতে শালাত বা কোষা নৌকো বেয়ে কোচ বা ঢালু হাতে মাছ মেরে বেড়ানোর গল্পে মেতে যেত সেন্টুদা।

কৈশোরে এসব গল্পের মায়াবী রোদ্দুরে পিঠ পেতে বসে না-দেখা 'দ্যাশ'-এর ছবি আঁকতে ভাল লাগত। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অরণির বাংলাদেশে পারিবারিক শেকড় নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন স্রেফ আদিখ্যেতা মনে হতে থাকে। যৌবনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে পড়ার পর হারানো সেই সম্পর্কগুলোর জন্য মন কেমন করলেও একদিন প্রতিদিনের

কঠোর -কর্কশ জীবনে পা দিয়ে বুঝতে পারে নীলকণ্ঠের খোঁজে বনবাদাড়ে ছুটে-বেড়ানো পণ্ডশ্রম, অতীত বিলাস মাত্র। সে পাখি আর কোনওদিন ফিরবে না। তারচেয়ে বরং এদেশের মাটিতে শেকড়টা আরও গভীরে চারিয়ে দেওয়া জরুরি। তারপর এল ভুবনগ্রামের আকাশে সোনালী ডানার পাখি হয়ে নিজেরাই উড়ে বেড়ানোর হাতছানি। তাতেই মজে গেছে অরণি, আরও বেশি করে অরিত্র। ছেলের উড়ালের জমি পোক্ত করতে কাবেরী-অরণি অহর্নিশ লড়ে যাচ্ছে।

সেন্টুদা, জুট মিলের শ্রমিক সেন্টুদা অবশ্য এ বাড়িতে এলেই 'দ্যাশ'-এর গল্পেই মেতে থাকত। বাবা-মায়ের সঙ্গে আড্ডায় বসলে শুধু পারিবারিক শাখা-প্রশাখায় কে কোথায় ছড়িয়ে, গ্রাম-সম্পর্কের দাদা-কাকা-মামারা কে কোথায় ছড়িয়ে তার খবরাখবর থাকত ওর ঝোলায়। এমনভাবে কথা বলত যেন অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় বেরিয়ে যায়নি। পরিচিত মানুষজন, গাছপালা, নদীনালার বয়স বাড়েনি। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে। মৃত্যুর আগেও সেন্টুদার পৃথিবী যে বদলায়নি তা টের পায় অরণি ওর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে।

—সেন্টুর বড় মামা, মাইজ্যা মামা, ধলা মামী, কালা কাকা— ত্যানারা সব বাইচ্যা বইরতা আছেন তো? তার মুখে সদায় তাগো কথা শুনছি। কথা কইতে বইলেই আবার প্যাচাল পাড়তো হ্যায়। কি তার দুশ্চিন্তা— ছুটো মামার দুর্বাসা মুনির মতো রাগ, হাই প্রেসারের রুগী। কবে কি অঘটন ঘইট্যা যায়। মাইজা মামার পোলাগুলি মানুষ হইল না। বুড়কালে তারে দ্যাহে কেডায়। ধলা মামীর ছুঁচিবাই। বুড়ি ঘরে কাউরে ঢুকতে দেয় না। এইদিকে বাতের ব্যাদনায় রাইতভর চিকুর পাড়ে। বড়মামার পোলা-মাইয়া সব বিদ্যাশে। বুইড়া বৃদ্ধাশ্রমে বইয়াও মেজাজ দ্যাখায়। তারে বাইর কইরা দিলে যাইবো কোনহাসে! কালা কাকার ব্যবসা উঠছে ডকে। ডাকতারে কইছে রোজ ডিমসিদ্ধ খাইতে। কেডায় তারে ডিম কিনন্যা দিয়া আহে! এইসব আনবান কথা কইত সেন্টু আমাগো লগে গপাইতে বইলেই।" স্বগতোক্তির ঢঙে বলছিলেন সেন্টুদার এক বয়স্কা প্রতিবেশিনী। মহিলার কথা শুনে কিছুটা অবাক হয় অরণি। সেন্টুদার এইসব গুরুজনেরা অনেকেই ইতিমধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। গুটিকয়েক যাঁরা বেঁচে আছেন, তাদের খবর সে রাখে না দীর্ঘকাল। কিন্তু রিটায়ারমেন্টের পর সেন্টুদা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুধু তাদের কুশলসংবাদ জানত না, সেসব এসে নিজের পাড়াপড়শিদেরও সাতকাহন শোনাত। মোবাইল-ইন্টারনেটের যুগে অরণি তার নিজের জগেতে দারুণভাবে 'কানেকটেড' থাকলেও সেন্টুদার পৃথিবী যে অনেক দূরে। আসলে সেন্টুদা একটা ফ্যান্টাসির জগতে বাস করত যার শরিক করে নিয়েছিল তার আত্মীয়স্বজন শুধু নয়, পাড়াপড়শিকেও।

কলকাতার এত কাছে থেকেও এই মানুষগুলো যে যথেষ্ট নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি, অরণি তা টের পায়। মহানগরের অ্যাপার্টমেন্ট সংস্কৃতি শহরতলিতেও ক্রম প্রসারমান। শহরে গায়ে পড়ে আলাপ, ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাকে অভব্যতা, গেঁয়োপনা ভাবা বা সন্দেহজনক বলে মনে করাটা বাড়ছে। বিচ্ছিন্নপ্রায় বসবাস যেখানে, সেখানে কেউ মারা গেলে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার শ্মশানবন্ধু ছেলেপিলে আর আগের মতো মেলে না। কদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় এক সহকর্মীর 'বডি' চারতলার ফ্ল্যাট থেকে নিচে নামিয়ে সৎকার সমিতির গাড়িতে তুলতে হিমসিম খেয়েছে অরণি ও তার অফিসের কয়েকজন। আশেপাশের ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে অনেক মুখ উঁকিঝুঁকি মারছিল বটে। মুখগুলিতে কৌতুহল ও ঔদাসীন্যের ছঅয়া বেশি, সমবেদনা কম। কেউ নিচে নেমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি।

পাড়াপড়শির বিপদে আপদে দৌড়ে যান না। সময় কোথায়!

পাড়া-বেপাড়ার ক্লাবগুলো এখন বড় বড় থিম পুজোর আয়োজন করে। কর্পোরেট বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যায় শহরের। মন্ডপে মন্ডপে ওড়ে এথনিক শিল্পকলা, লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি নাগরিক অনুরাগের ধ্বজা। সেরা পুজোর পুরস্কার ছিনিয়ে আনতে বনসাই গ্রাম উঠে আসে উৎসবের দিনগুলোয়। শহরের অলিগলি বা চিলতে পার্কের মাটিতে। ফুটপাথে ধানখেত ফনফনিয়ে ওঠে। উডের কাশবনে দিগন্তহীন আকাশের তলায় স্ট্যাচু হয়ে থাকে অপু আর দুর্গা। অ্যাপার্টমেন্ট পাড়ায় পুজোর কদিন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হইচইয়ে প্রীতিময় প্রতিবেশের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু পুজোর রেশ কাটতেই ফের দেওয়াল ওঠে ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে। শহরতলির ছবিটাও বদলাচ্ছে। আগের মতো রকবাজ, ক্লাবসর্বস্ব ছেলেছোকরার দল বিশেষ মেলে না যাদের কাজই ছিল পাড়পড়শির বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই শিল্পাঞ্চলেও এখন তারস্বরে বাজছে বাংলা ব্যান্ডের সপ্রতিভ গান— মা দেখা দে, নয় টাকা দে। তবু সেন্টুদার মৃতদেহ ঘিরে কলোনিপাড়ার ছেলেদের তৎপরতা দেখে অরণি বুঝতে পারে, বৃহত্তর কলকাতার নগরায়ন এখনও অসম্পূর্ণ। — 'কাকায় কইতো কল্যাইন্যা আমার আর একটা পোলা। কমলায় যদি আম্বালা থিক্যা না আইবার পারে ঠিক সময়ে, তুই আমার মুখে আগুন দিস রে বাবা! আমি তর কাকিরে কইয়া যামু রে!'

কল্যাণ নামে সেন্টুদার পাড়ার এক যুবকের এহেন স্মৃতিচারণে মিতাবৌদির বিলাপ ফের উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

—ঘরবাড়ি পইড়্যা রইল, সংসার পইড়্যা রইল, হ্যায় কোই চইল্যা গেলো রে, কল্যাইন্যা! আইজ হকালেও হ্যায় আমারে কইছে, ইলসা মাছ আনছি, পোলাডারে ডাইক্যা খাইতে দিও। হ্যার বাপের ফ্যাক্টরি বন্ধ কয়েকমাস। হ্যায় নিজেও বালামুসিবতে আছে পাট্টিপুটির ঝামেলায়। পোলার শরীলডা শুকাইয়া গ্যাছে গো। তরে ইলসা খাওয়াইতে কইয়া হ্যায় কোই গিয়া বইয়া রইল রে।

কমলের বন্ধু কল্যাণের প্রতি সেন্টুদার স্নেহের বর্ণনা দিতে দিতে মিতা বৌদি ফের তার বিলাপের অন্তরায় ফিরে এসেছিল— ইলসা মাছ পইড়্যা রইল, তুমি কই গেলা আমাগো থুইয়া...

এই শোকসঙ্গীতের আলাপ-ঝালা, পর্ব থেকে পর্বান্তরে কলোনির অন্যান্য কিছু মহিলা ও পুরুষ গলা মেলান যাতে শোক পালনের গুরুভারে মিতাবৌদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের সমবেত স্মৃতিচারণে, অশ্রুপ্লাবনজনিত শিকনিতে রুদ্ধ নাক সশব্দে ঝাড়ার

জন্য প্রয়োজনীয় বিরতিসহ বৃন্দবাচনে সেন্টুদার যে ছবি নির্মিত হয়, তাতে গ্রাম্যতার পুরনো লক্ষণসমূহ, উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর যূথচেতনার আদি প্রকাশচিহ্নগুলিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি অরণির। এসবের মধ্যেই তো তার শৈশব কেটেছে। কিন্তু শোকপ্রকাশের এই স্থূলতা, ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের এই বাড়াবাড়ি তাকে বিরক্ত, বিড়ম্বিত করে। তার নাগরিক, ভদ্রলোকি শিল্প-রুচিতে শোকের যে মার্জিত রূপ অনুমোদিত, তাতে এই উচ্চকিত কলরোল আদিখ্যেতা বলে নিন্দিত। তাছাড়া লোকগুলো দৈনন্দিন আত্মীয়তার যে টুকরো টুকরো গলা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলেছে তা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যও নয়। এত অবসর আছে নাকি আজকের জীবনে? একে অপরকে এতটা জানার? জড়িয়ে বুড়িয়ে থাকবি। এ তো এক কল্পকাহিনী যা হয়তো এরা পূর্বসূরিদের কাছে শুনেছে। ছিন্নমূল স্মৃতিতে, অতীত নির্মাণে, অবচেতনের আকাঙ্ক্ষায় হয়তো এমন ওতপ্রোত জীবনের স্বপ্ন আছে। এই সমবেত বিলাপ সেই ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্নের তর্পণ মাত্র। নইলে অনেককাল ধরেই 'পাট্টিপুট্টি'র ভোট-রাজনীতির আর্বতে ক্ষতবিক্ষত, বিভক্ত এখানকার সমাজ-সংসার। একের পর এক বন্ধ কলকারখানার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে, মোড়ে বাড়ির মতো জঙ্গলাকীর্ণ ফ্যাক্টরি শেডের ভিতরে এখন চোলাই শিল্প আর বোমা তৈরির আড্ডা। কারখানার জমিতে ফ্ল্যাটবাড়ি, শপিং মল তৈরির বখরা নিয়ে নানা প্রোমোটার-মস্তান-নেতা চক্রের লড়াই বাধে প্রায়ই। পলাশ পড়ে আকছার। এখানকার বেকার শ্রমিকদের মহল্লা থেকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতার ব্যস্ততম মোড়গুলিতে, ঝাঁ চকচকে ফ্লাইওভারের মুখে দাঁড়ানো 'ফ্লাইং মেয়েছেলে' সাপ্লাই যায়। এইসব নিরক্ত বিবর্ণ শিল্পাঞ্চলে সেন্টুদা এক বিস্মৃতিপ্রায় অতিকথার শরিকমাত্র।

অরণি বোঝে, আত্মবন্দি শহর আর কিছুদিনের মধ্যেই এই অতিকথাকে পুরোটাই গিলে ফেলবে। সেও ঢুকে পড়বে সেই ???? তারপরও রাস্তাঘাটে, অফিসে, মলে উচ্চরিত হবে কুশল প্রশ্ন— 'কেমন আছো? কেমন আছিস? কেমন আছেন? হাউ আর ইউ?' কিন্তু সবাই ইতিমধ্যেই জানে, এসবই কথার ধরতাই মাত্র। এর পিছনে কোনও আন্তরিক জিজ্ঞাসা নেই, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নেই, প্রীতি বা শুভেচ্ছা নেই। সেন্টুদা ও তার পৃথিবী বেঁচে থাকবে গল্পকথায়, যেমন বেঁচে আছে অ্যালেক্স হ্যালির 'রুটস' উপন্যাসের সেই গাঁওবুড়ো যে উত্তরপুরুষকে বলে যায়— তার গ্রামে থাকে তিন ধরনের মানুষ, যারা বেঁচেছিল, যারা বেঁচে আছে আর যারা জন্ম নেবে বলে অপেক্ষায়। সেই প্রবাহমান জীবনের বিরতি বা যতিচিহ্নহীন স্রোত থেকে, সেন্টুদার শাখাপ্রশাখাময় গ্রাম্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বিন্দাস বেঁচে আছে অরণি। তুব গঙ্গার ঘোলাটে জলে সেন্টুদার দগ্ধাবশেষ তলিয়ে যাওয়ার অস্ফুট শব্দে সে বিষণ্ণ হয়। শ্মশানের ঘাট ছাপিয়ে জোয়ারের জল কখন উপরে উঠে এসেছে বুঝতে পারেনি। চিতাকাঠ, ফুলমালা, বাঁশবাখারি, ???? ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জোয়ারের জল ছলাৎ। শ্মশানবন্ধুদের ডাকে সম্বিত ফেরে অরণির। 'উঠে এসো তাড়িাতাড়ি, জলের খুব টান এখন। সামলাতে পারবে না এরপর'। কে যেন বলছিল। ভেসে যেতে মোটেই আগ্রহী নয় অরণি। তবু পিছন ফিরে একবার তাকায়। তারপর যেন নোংরা, আবর্জনাময় প্রবাহকে শুনিয়ে ফিসফিস করে ওঠে— 'ভাল থেকো, সেন্টুদা। যেখানেই থাকো, ভাল থাকো। বাবা-মার সঙ্গে দেখা হলে বোলো, আমি ভাল নেই।'

r